সহবাস

অঞ্জন সেনগুপ্ত

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে ওরা অনেকটা উপরে চলে আসে। এখন শুধু কিছু বিন্দুর ওঠানামা। কিছুটা নিচে নেমে এলে কালো বিন্দুগুলো ক্রমশই সাদা—স্পষ্ট হয়ে যায়। তারপর আরো সাদা—আরো স্পষ্ট । বড়ো থেকে আরো বড়ো। সবশেষে এক ঝাঁক সাদা মেঘ যেন হঠাৎ ঝুপ্ করে একেবারে নিচে নেমে আসে। গুছিয়ে বসে ওদের পুরানো আস্তানায়। শব্দ করে একে অপরের চারদিকে গলা ফুলিয়ে ঘুরতে থাকে। যেন বলতে চায়—কিহে, বৈকালিক ভ্রমণটা কেমন হল? এতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং মনটাও। মানুষগুলোকে অত উঁচু থেকে প্রায় দেখাই যায় না। অসহায় মানুষগুলোর জন্য তখন বড় কষ্ট হয়। কারণ ওদের গন্ধ শুঁকে শুঁকেই তো এতটা পাওয়া। দুটো ভাল-মন্দ খাওয়া। এমন নিরিবিলি সুন্দর আস্তানা ক'জনের ভাগ্যে জোটে। এমন বংশানুক্রমিক রাম-রাজ্য। কেউ কোথাও নেই। প্রায়শই শুনশান থাকে। শুধুমাত্র রাতের অন্ধকারে কারা যেন আসে। বড় নিঃশব্দে। নিচু গলায় কথা বলে। কারোর ঘুম ভাঙাতে চায় না। তেলচিটা মাদুরগুলো টানটান করে মেঝেতে পেতে কিছুক্ষণ গোল হয়ে বসে। ট্যাঁক থেকে দু'একটি বিড়ি বেরিয়ে আসে। আগুনের ছোট ছোট আলোগুলো বার কয়েক হাত ঘোরে। তারপর ফিস্ ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কিছু জরুরি কথা বলে হাতের ওপর মাথা রেখে ওরা সারসার দিয়ে শুয়ে পড়ে। অথচ কাকভোরেই সব পরিষ্কার। কেউ নেই! সব যেন কর্পূরের মতো উবে যায়। কোথা থেকে আসে বা ভোর হতে না হতেই ওরা কোথায় চলে যায় এসব না ভাবাই ভাল। আমরাও যেমন আছি, ওরাও তেমন থাক। আমরাও ওদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবো না, ওরাও যেন আমাদের বিরক্ত না করে। যদিও মানুষদের বিশ্বাস নেই। এক ধরনের মানুষের অনুগ্রহে আমরা বেঁচে থাকি। খাই-দাই। গায়ে গতরে বাড়ার সাথে-সাথে বংশবৃদ্ধিও ঘটে। আবার আর এক ধরনের মানুষ আমাদের ধরে। কেউ পয়সার জন্য বিক্রি করে। কেউ বা আমাদের হাড়-মজ্জাগুলো সানন্দে চুষে খায়।

চৌহদ্দির পেছনের দিকে প্রাচীরের গা ঘেঁষে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে সরু রাস্তাটা বোসবাবুদের সীমানা পাড় হয়ে একটা গলির ভিতরে ঢুকে গেছে। দারোয়ানের সেদিকে একেবারেই নজর নেই। অবশ্য নজরে আসারও কথা নয়। সপ্তাহে মাত্র একদিন সে আসে। বড় ফটকটা আর সে খোলে না। শুধু পাশের ছোট আটপৌরে দরজাটা খুলে এক নজর চোখ বুলিয়ে নেয় লোলচর্ম অশীতিপর এই বৃদ্ধ বাড়িটির দিকে। কাকের বিষ্ঠা থেকে গজিয়ে ওঠা বট-অশ্বত্থ গাছগুলো তাই মহানন্দে এতটা বাড় বাড়তে পেরেছে। শরীরটাকে চৌচির করে লম্বা শিকড়গুলো ঝুলিয়ে দিয়েছে নিচে। গিরগিটি,

তক্ষক আর কিছু মেটে কাঠবিড়ালী মাঝে মধ্যেই ঐ শিকড়গুলো বেয়ে উপরে উঠে আসে। কখনও বা মহানন্দে দোল খায়। বহু অযত্নে ভুস্‌ভুসে পলেস্তরা ওদের ছুটোছুটিতে ঝুপ্‌ঝুপ্ করে খসে পড়ে। পুরানো ঐতিহ্য বুঝি এইভাবেই রাগ করে। প্রায় বিশ বছর ধরে এই বিশাল বাড়িটি মাঝে মধ্যে তার একাকীত্ব নিয়ে প্রথম প্রথম বেশ কয়েকবার কান্নাকাটি করেছে। এখন আর করে না। তবে মাঝে মধ্যে এভাবে পরগাছা গজিয়ে ওঠার জন্য শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। ইট-মশলার ফাঁক দিয়ে যখন ওদের শিকড়গুলো সূক্ষ্ম সূচের মত ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে তখন সে যন্ত্রণার কোন ভাষা থাকে না। একটা চিরবিরে যন্ত্রণা। এরকম ডাইনে-বাঁয়ে কখনও বা মাথার ওপরে অজস্র ছোট বড় যন্ত্রণা রাতদিন এই শরীরটাকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে। দেখার লোক থেকেও নেই। আর বলার লোক যে কত বছর নেই তা কড় গুনে হিসেব করতে হবে।

প্রায় ষাট বছর আগে বুড়োবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন। এক বছর পর পর রং করাতেন। বাড়ির গায়ে নোংরা লাগতে দিতেন না। তখন দু'দুটো কাজের লোক বাড়ির ভিতরে ও বাইরে পরিষ্কার রাখত। কি চক্‌চক্‌ই না করত বাড়ির শরীর। আর মণ্ডপটার অবস্থাও তথৈবচ। দেখলে কান্না পায়। ওর বয়স অবশ্য এ বাড়ির থেকে কম। প্রথম প্রথম আরো ডানদিক বরাবর পুজোর আয়োজন করতেন বুড়োবাবু। তারপর কি যেন একটা কারণে পুজোর ব্যবস্থা হল এই মণ্ডপের জায়গায়। দু' এক বছর এমনই টিনের ঘর করে পুজো হয়েছিল। তারপর বুড়োবাবু তৈরি করালেন এই মণ্ডপ। বয়সে এই বাড়ির থেকে কম হলে কি হবে, অযত্নে-অবহেলায় আর ঐ আমাদের সারা মণ্ডপ থিক্‌থিক্ করছে। বছর বিশেক আগে যে পুজোটা ধুমধাম করে হয়েছিল তাতে কত লোকই না এসেছিল ঠাকুর দেখতে। শেষদিন হয়েছিল পংক্তি ভোজ। এতবড় বাড়িতেও যেন সংকুলান হতে চায় না। রাস্তায় নেমে গিয়েছিল লোকের সারি। এখন এসবই ইতিহাস। ভাবলে ভেতরের চাপা কান্নাটা বেরিয়ে আসতে চায়। তাই বাড়ির দেওয়ালের সাথে সাথে মণ্ডপের চত্বরেও দুব্বো গজিয়ে উঠেছে। দেখভাল করার লোক থেকেও নেই। কার গোয়ালে কে দেয় ধোঁয়া। মাস কাবারি পাঁচশো টাকা তো দিব্বি পাওয়া যাচ্ছে। রোজ রোজ না এলেও যদি তা পাওয়া যায় তাহলে আর অসুবিধাটা কোথায়। রামচাঁদ এই ব্যাপারটা এখন সপ্তাহে করে নিয়েছে। সপ্তাহান্তে একবার করে এসে শুধু চোখ বুলিয়ে যাওয়া। কাউকেই সে বিরক্ত করে না। আমিও যেমন এই বাড়ির আনুকূল্যে মাসে মাসে পাঁচশো টাকায় খেয়েপরে রয়েছি, তোরাও তেমন থাক। একে অবলম্বন করেই থাক। বেঁচে-বর্তে থাক।

রামচাঁদ ছাতুয়া। এটাই ওর পরিচিত নাম। প্রথম প্রথম এ নাম ধরে কেউ ডাকলে ও ভীষণ রেগে যেত। শুধু বুড়োবাবু ছাড়া। অবশ্য বুড়োবাবুও খুব একটা এ নামে

ডাকতেন না। যদিও তিনিই এই নামকরণটি করেছিলেন। বুড়োবাবু চলে যাওয়ার সাথে সাথে রামচাঁদ ছাতুয়ার আসল নামটিও উধাও হয়ে গেছে। হয়তো এখন বুড়িমার মনে থাকলেও থাকতে পারে। আসল কথা হচ্ছে সেই নাকে পোটাপড়া অবস্থায় রায় সাহেবের দারোয়ান দেশোয়ালি গজুভাইয়ার সাথে যেদিন প্রথম কাঁপতে কাঁপতে একটা চাকরির জন্য বুড়োবাবু কাছে এল সেদিন তো প্রথম দর্শনেই বুড়োবাবু হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন—এ গজুয়া, ই নাদান লড়কা হামরা ঘরমে কা কাম করিবে।

গজু ভাইয়া রামচাঁদের মাথার চুলে বিলি কেটে নিজের ঝুলেপড়া ইয়া তাগরাই গোঁফ জোড়াকে টানটান করে বলল—আপতো হামকো ছোটাসে দেখতানি। তব তো হামরো রায় সাহেব কো ভি মালুম নেহি থা কি উসকা ছোট্টা গজুয়া বড়া হোকে ইতনা বড়িয়া পালবান বন যায়েগা। রামচাঁদের মাথার চুল টেনে গজুয়া আবার বলল—ই রামচাঁদ কামতি আছে বাবু। হামরো দেশোয়ালি ভাই। ইসকো রাখ লিজিয়ে। কামমে আ যায়েগা।

—খানা পাকানেকো আদত হ্যাঁয় ইসকা? বুড়োবাবু জানতে চাইলেন। গজু ভাইয়া বার কয়েক রামচাঁদের দিকে চোরা চোখে তাকিয়ে বলল—হাঁ-হাঁ, কিউ নেহি। তারপর আমতা আমতা করে বলল,

—কিস্‌কা খানা বাবু? আপকো ঘরকা খানা?

বার কয়েক মাথা দুলিয়ে বুড়োবাবু বললেন—নেহি, হামারে নেহি। আপনকো খানা।

গজু ভাইয়া এবার যেন একটু নিশ্চিন্ত হল। বার কয়েক মোচে তা দিয়ে বলল—ইসকো খানাকে লিয়ে চিন্তিত মত হইয়ে বাবু। চাউল সে জাদা প্যায়ারা হ্যাঁয় ছাতুয়া। মকাইকা ছাতুয়া মিল যায় তো সমঝিয়ে কি ইসকা ভোজন বহুৎ আচ্ছা হুয়া।

হো হো করে হাসতে হাসতে বুড়োবাবু বললেন—ছাতু জিসকা ইতনা প্যায়ারা হ্যাঁয় — উস্‌কা নাম তো ছাতুয়া হোনা চাহিয়ে।

গজু ভাইয়া সাথে সাথে ফোঁড়ন কেটে বলেছিল — হাঁ বাবু আপ ইয়ে সমঝ লিজিয়ে কি আজসে ইস্‌কা নাম ছাতুয়াই হো গিয়া। তো ইসকো আজসে কামপে লাগাদু। বুড়োবাবু কিছু বলার আগেই গজু ভাইয়া রামচাঁদের মাথায় একটা মৃদু চাটি মেরে বলল—আরে ই ছাতুয়া বুড়োবাবুকো গোড় ছুঁ।

—ঠিক হ্যাঁয়। ধ্যান লাগাকে কাম করনা। বুড়োবাবু বৈঠকখানা ছেড়ে অন্দর মহলে চলে গেলেন। সেই থেকেই এ বাড়িতে রামচাঁদ কামতি ওরফে রামু ছাতুয়ার শুরু। আজও ষাটোর্দ্ধ বয়সেও যার শেষ নেই। সেদিনের দায়িত্ব এতটা গুরু ছিল না। বুড়োবাবু আর গিন্নীমার হুকুম তামিল করা মাত্র। সেই স্বল্প দায়িত্বই দিন দিন এতটাই ওজন নিয়ে ওর কাঁধে চেপে বসেছে যে আজও ওকে সিন্ধাবাদের মত এই বিশাল বাড়ির দায়িত্ব বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। কতবার সে গিন্নীমার কাছে এ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি চেয়েছে। কিন্তু মার সেই একই কথা—রামু তুই আমার ছেলের মত। আমি এ বাড়িতে

ফিরে না এলে তো এ বাড়ি থেকে তোর যাওয়া চলবে না বাবা। তুই পারবি এ বাড়ির মায়া ছেড়ে চলে যেতে? বাবুর কথা তোর মনে পড়বে না?

একটা তপ্ত নিঃশ্বাস রামুর বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। সত্যিই বড়বাবুর কথা মনে পড়লে আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের অনেক ছবি। তখনও বড় খোকা হয়নি। বাড়িতে বড়বাবু আর গিন্নীমা। তখন গিন্নীমাকে মাইজি বলে ডাকত রামু। মাইজি যে কবে গিন্নীমাতে রূপান্তরিত হয়েছে আজ আর রামু সেকথা মনে করতে পারে না। তখন ঐ দু'জন লোকের জন্য কাজের লোকই ছিল বেশি। ভিতর বাড়ির সব কাজ করত তিন জন ঝি। বাইরের কাজ ছিল রামুর দায়িত্বে। বাবুর সাথে বাজার যাওয়া, বিশাল বাড়ির চৌহদ্দি পরিষ্কার রাখা, বৈঠকখানায় কেউ বাবুর খোঁজে এলে তাঁকে বসতে বলে বাবুকে খবর দেওয়া। চা-জল খাবার বৈঠকখানায় পৌঁছে দেওয়া ইত্যাদি সবই এক হাতে সামলাতো রামু। সেদিনের সেই রামচাঁদ ছাতুয়াই হল এই বিশাল বাড়ির রাখোয়ালা। সপ্তাহে একবার করে আসে। ঘরদোর খোলে। ঝাড়ু দেয়। আবার বন্ধ করে চলে যায়। রামুর বাইরে একেবারেই নজর নেই বলেই বাড়ির গায়ে ফাটল ধরেছে। শিকড় ঝুলছে দেওয়ালের ফাটল থেকে। জঙ্গলে ভরে গেছে বাড়ির চৌহদ্দি। বট-অশ্বত্থ ধাঁই ধাঁই করে বড় হয়ে যাচ্ছে। যে বাড়িতে একটা সূচ পড়লেও আগে খুঁজে পাওয়া যেত আজ সেখানে পায়রার বিষ্ঠা, আধপোড়া বিড়ি থিক্ থিক্ করছে। রামচাঁদ বোঝে যে এখানে কোন গোপন একটা আড্ডা হয়। নিশ্চিন্ত জায়গা। ওসবের জন্য একেবারে উত্তম। কিন্তু ওরা যে কখন আসে তা রামু কিছুতেই বুঝতে পারে না। খুব ভোরে এসেও রামু দেখেছে কেউ কোথাও নেই। শুধু কিছু বাসি বিড়ির টুকরো এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে।

রামচাঁদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে যেদিন ছোট খোকা কলেজের চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে চলে গেল সেদিন রামু ভেবেছিল এ বাড়ির একদিকে একটা বাথান করবে। প্রথমে দুটো গরু দিয়ে না হয় শুরু করবে। তারপর হাতে পয়সা এলে আরো কেনা যাবে। তবে ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত ভাবনাতেই রয়ে গেছে। রামুর আর বাথান করা হয়ে ওঠেনি।

যাক্‌গে এবার আর কোন চিন্তার কারণ নেই। ওদের শুনেছি মতিগতি ফিরেছে। একবার বাড়িতে এলেই যার জিনিস তাকে দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে পারবে। বয়স তো আর কম হল না। এ বয়সে আর পরের জিনিস আগলে বসে থাকতে ভাল লাগে না।

বছর চারেক হল ফুলিয়া মারা গেছে। বড়বাবুই রামচাঁদের বিয়ে দিয়েছিল ফুলিয়ার সাথে। কসবার খাটাল মালিক রামলখনের ছোট বেটি ছিল ফুলিয়া। তখন ফুলিয়ার কতই বা বয়স হবে। বড় জোর দশ-এগার বছর। মস্ত বড় ঘোমটা দিয়ে পায়ের মল বাজিয়ে সবুজ লন পার হয়ে গিন্নীমার কাছে যেত। রোজ গিন্নীমার চুল বেঁধে

দেওয়া ছিল ফুলিয়ার কাজ। কলকাতায় জন্ম বলে ফুলিয়া বাংলাটা ভালই জানত। ইদানীং এসব ভাবলে রামুর চোখটা ঝাপসা হয়ে আসে। এখন বড় একা লাগে। মেয়ের ঘরের মেয়ের গত বছর বিয়ে হয়েছে। এই নাতনিটা ছোট থেকে রামুর কাছেই থাকত। বড় আদরের ছিল। একমাত্র ছেলে ভাদুরাম। সেও থাকে দেশের বাড়ি মধুবনী জেলার তিলসুনিয়া গ্রামে। ওখানে যতটুকু জমিজিরেত আছে সেটা ও নিজেই দেখভাল করে। গত বছর রামু ওকে দুটো ভইষ কিনে দিয়েছে। দিনে দুবার দুধ দেয়। প্রায় একমন। মন্দ কি। জমিও চাষ হচ্ছে আবার ব্যাঙ্কে টাকাও জমছে। শুধু ছেলেটার জন্যই রামু আর একদণ্ডও কলকাতায় থাকতে চায় না। ভীষণ দুশ্চিন্তা হয়। ছেলেটার মতিগতি ঠিক নেই। উঠতি বয়েস তাই রামু সাত তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিয়ে ছিল। অথচ রামু শুনেছে বৌমাকে নাকি ও বছরে প্রায় দশ মাসই বাপের বাড়ি রেখে দেয়। আর কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে ছোটুলালের বিধবা মেয়েটার সাথে ইদানীং ভাদুরামের সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পাড়ার লোকেরা এসব আদৌ ভাল চোখে দেখছে না। কিন্তু যেহেতু ছোটুলাল মাস্তান সেইজন্য কেউ সাহস করে এসবের প্রতিবাদও করতে পারে না। রামচাঁদের মনটা ভারী হয়ে ওঠে। হয়তো এখনো সময় আছে। ছেলেটা এইভাবে উচ্ছন্নে যাবে আর ও কিনা কলকাতার বাগবাজারে একটা পুরানো ঐতিহ্যের দারোগাগিরি করে যাবে—এ আর চলতে পারে না। এবার ভালোয় ভালোয় ওরা আসুক, তারপর ওদের সব বুঝিয়ে দিয়ে চিরদিনের মতই এ শহর ছেড়ে ও চলে যাবে।

রামচাঁদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিলসুনিয়া গ্রামের হরিয়ালি আর হরিয়ালি। রাস্তার দু'ধারে শুধু মাকই-ভুট্টা আর আখের ক্ষেত। রাস্তাটা বড় রাস্তা থেকে বের হয়ে এঁকে বেঁকে প্রায় দু'ক্রোশ দূরে তিলসুনিয়া গ্রামে গিয়ে শেষ হয়েছে। গ্রামে ঢুকতেই বাঁ দিকে মুখিয়াজির বিরাট দোমহলা বাড়ি। তারপর ডাইনে ঘুরে বড় ইন্দারা। আর তার ঠিক উল্টো দিকেই রামচাঁদের বাড়ি। শেষ কবে গ্রামে গিয়েছিল ঠিক মনে করতে পারে না রামু। তবে এই ভিড়ভাট্টার কলকাতা শহরটাও তো কম আপনার নয় রামুর। এই আজনবী শহরটাও তো ওকে কম কিছু দেয়নি। বেঁচে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। সাদি করার সাহস দিয়েছে। বাল-বাচ্চা পালন করার ভরসা দিয়েছে। সর্বোপরি অফুরন্ত প্রাণশক্তি দিয়েছে, যার জোরে আজও রামু সাতের কোঠার কাছাকাছি এসেও দিব্বি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, দু'হাতে আগলে রেখেছে পুরানো ঐতিহ্য। রামু ঠিক করেছে আগামী সোমবার থেকে সে এই বাড়ির কাজ শুরু করবে। এরমধ্যে রাজমিস্তিরি খুঁজে ওদের সাথে দরদাম করতে হবে। তবে এ বাড়ির যা কাজ সবটাই বাইরের। ভিতরের বলতে শুধু চুনকাম করা।

রামচাঁদের বারবার লোক এনে বাড়ির কাজ দেখানোয় ওরা সবই বুঝতে পেরেছে। এখন আর অত ওড়াউড়ি করে না। সব সময় একটা মনমরা ভাব। দিনরাত গভীর